দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

# নাগরিক

প্রথম বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • ৬ মে ২০২৪

## ভিতরের পাতায়


- রাজনৈতিক প্রচার ও তার প্রতিক্রিয়া
- মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেন হঠাৎ আক্রমণাত্মক মোদী
- স্বদেশী আন্দোলন, হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক এবং রবীন্দ্রনাথ
- মনমোহন সিং বনাম নরেন্দ্র মোদি
- মে দিবস জিন্দাবাদ
- কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহার ‘ন্যায়পত্র’
- প্রথম দফার ভোটে বিজেপির হাল

চিত্র : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : soura.basu@gmail.com

ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

## কেন ‘নাগরিক’

দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ নাগরিক এখন আরএসএস নিয়ন্ত্রিত এক হিন্দুত্ববাদী সরকারের হাতে পড়ে গত দেড় দশক ধরে ক্রমাগত কোণঠাসা। পিঠ তার ঠেকে যাচ্ছে দেওয়ালে। সরকার এমন সব আইন আনছে যে, দেশের বৈধ সব নাগরিক অ–নাগরিক হয়ে যাওয়ার ভয়ে ত্রস্ত। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নেই। তারা ট্রেনে বাসে পথে ঘাটে নিজ বাড়িতে আক্রান্ত রক্তাক্ত। ধর্ম সংস্কৃতি শিক্ষা; সব জায়গায় গায়ের জোরে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে হিন্দুত্ব। নাগরিকেরা কি খাবে কি পরবে কি ভাষায় কথা বলবে, তার ওপরেও জোর খাটাচ্ছে মোদীর সরকার। এদিকে রাজ্যের ক্ষমতাসীন সরকারের নেতা- নেত্রীরাও দুর্নীতির পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। বিনা দোষে চাকরি খোয়াচ্ছে হাজার হাজার যোগ্য তরুণ। তাবড় সংবাদ মাধ্যম বিজেপি–তৃণমূল বাইনারির মধ্যে আটকে; যেন অন্য কোনও বিরোধী কণ্ঠস্বরের অস্তিত্ব নেই। অন্য স্বর বা ভিন্ন স্বরের কণ্ঠরোধ করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন। এই সময়ে প্রতিবাদের এক স্পষ্ট এবং জোরালো কণ্ঠ হয়ে উঠবে ‘নাগরিক’। বাজারি খেউরে গা না–ভাসিয়ে ‘নাগরিক’ কার্যকর কোনও প্রতিবাদ করতে পারছে কিনা, মানুষের লাঞ্ছনার ছবি আর তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিবাদের কথা তুলে ধরতে পারছে কিনা ভবিষ্যৎ বলবে, পাঠক বলবেন। যাত্রা শুরু হল। জয়ী হোক ‘নাগরিক’।

# রাজনৈতিক প্রচার ও তার প্রতিক্রিয়া

মজিবুর রহমান

রাজনীতি হল নীতিগত লড়াইয়ের সর্ববৃহৎ মঞ্চ। রাজ্য বা রাষ্ট্র পরিচালনা তথা 'জনগণের সেবা' করার উপযোগী নীতি-আদর্শ নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। লক্ষ্য এক হলেও পথ পৃথক হওয়ার জন্য আলাদা আলাদা দল তৈরি হয়ে থাকে। দলের ঘরোয়া বৈঠকে সেই পথ ও পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আজকাল অবশ্য মতাদর্শের কথা বলার থেকে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ তোলার প্রবণতাই বেশি। এই অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের পথ ধরেই পার্টির প্রচারের কাজ এগিয়ে চলে। কিন্তু এই ধরনের প্রচারে মানুষ কতটুকু প্রভাবিত হয়? অভিযুক্ত ব্যক্তি বা দলের ওপর মানুষের মনোভাবে কতটুকু পরিবর্তন ঘটে? একটু অনুসন্ধান করা যাক।

জন্মলগ্ন থেকেই বিজেপি একটা মুসলিম বিরোধী হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল। স্বভাবতই বিরোধীরা বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা তথা ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ একাধিকবার প্রমাণিতও হয়েছে। কিন্তু এর ফলে কি তারা রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? তেমন তো মনে হয় না। এটা ঠিক যে, হিন্দুত্ববাদী দল হওয়ার কারণে বিজেপিকে মুসলমানরা সাধারণত ভোট দেন না। বিজেপি বোধহয় মুসলমানদের ভোট প্রত্যাশাও করে না। তবু তারা জেতে। এর একটা সহজ গাণিতিক হিসাব রয়েছে। ঠিক যে কারণে বিজেপি মুসলমানদের ভোট পায় না ঠিক সেই কারণেই হিন্দুদের একটি অংশের ভোট ভোট পেয়ে থাকে। দেশের অধিকাংশ কেন্দ্রে ৮০ শতাংশ হিন্দু ভোটারের অর্ধেকের সমর্থন পাওয়াই বিজেপির জয়লাভের জন্য যথেষ্ট। সে লক্ষ্যেই তারা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং সফল হয়।

কাজেই দেশের অহিন্দুদের জন্য বিজেপি কতটা মারাত্মক তার কাহিনী শুনিয়ে ভোটের রাজনীতিতে বিজেপিকে আটকানো সম্ভব নয়। বরং দেশবাসীর অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ মনন তৈরি করার ওপর জোর দেওয়া দরকার, যাতে মানুষ কোনো সম্প্রদায়ভিত্তিক দলকেই সমর্থন না করে। একাজ করতে হলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতানেত্রীদের ধর্মের ব্যাপারে নির্মোহ হতে হবে। ধর্মপালনকে ব্যক্তিগত স্তরে আবদ্ধ রেখে প্রকাশ্য ধর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। দলবল নিয়ে মন্দিরে পুজো, মাজারে চাদর দেওয়া, ইফতারে অংশ নেওয়া বন্ধ করতে হবে। কৌশল হিসেবে নরম হিন্দুত্বকে আশ্রয় করা চলবে না। মনে রাখতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর পক্ষে নরম হিন্দুত্বকে হাতিয়ার করে বেশি সংখ্যায় হিন্দু ভোট পাওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুদের যে অংশটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ভোট দেয় তারা সত্যিকারের হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপিকেই দেবে। নতুন করে রাম নবমীতে ছুটি দিয়ে অথবা দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করে টিএমসি বিজেপির কাছ থেকে হিন্দু ভোট ছিনিয়ে নিতে পারবে না। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলে বিজেপিকে হারানো যাবে না। বরং বিজেপির হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বাড়তে পারছে মুসলিমপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর নরম মনোভাবের কারণে। যেমন, পীরজাদা নওসাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ একটি সম্প্রদায়ভিত্তিক দল, যার বেড়ে ওঠায় কয়েকজন বামপন্থী নেতার ভূমিকা অস্বীকার করা

যায় না। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে টিএমসি'র পেছন থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমর্থন সরানোর লক্ষ্যে ধর্মীয় নেতা আব্বাস সিদ্দিকীকে মদত দেওয়া হয়েছিল। আইএসএফ-কে সঙ্গে নিলে টিএমসি-র দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে জোর আসতে পারে কিন্তু বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমপন্থী আইএসএফের অস্তিত্ব যত প্রকট হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপির শক্তি তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ দল একসাথে বেশিদিন চলতেও পারে না। ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জাতীয় স্তরে বিজেপির সঙ্গে এক মঞ্চে অবস্থান আর রাজ্যে আইএসএফের সঙ্গে তিন বছরের বন্ধুত্বের ফল বামেদের পক্ষে ভালো হয়নি, কিন্তু ওই দুই সাম্প্রদায়িক দল অনেক লাভবান হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি বিজেপির প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভার সদস্য থেকেছেন, একাধিকবার জোট বেঁধে ভোটে লড়েছেন। আজ যখন রাজ্যে প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে তখন বিজেপির বিরুদ্ধে টিএমসি-র সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগের গুরুত্ব থাকে না। বিজেপির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানেই বা কতটুকু আন্তরিকতা? দেশ নয় দলীয় স্বার্থেই সাধারণত জোট বাঁধার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। তাই বিজেপি বিরোধী জোটের জট কখনও কাটে না এবং লোকসভা নির্বাচনেও স্থানীয় ইস্যু তুলে জাতীয় ইস্যুকে লঘু করে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যে সেটাই ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

টিএমসি-র দুর্নীতি নিয়ে বিরোধীরা সকলেই সোচ্চার। উঠতে বসতে টিএমসি-কে চোর বলা হচ্ছে। দুর্নীতির অভিযোগে টিএমসি'র বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী জেল খাটছেন। দলটির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা অভিষেক ব্যানার্জিকে এখনও পর্যন্ত জেলবন্দি করতে না পারার আক্ষেপ ও অসন্তোষ প্রতি মুহূর্তে ঝড়ে পড়ছে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ সহ কলকাতা হাইকোর্টের একাধিক বিচারপতির কণ্ঠে। মেইন স্ট্রিম প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় শাসকদলের দুর্নীতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা চলছে। ২০২১ সালে মমতা ব্যানার্জি তৃতীয় বারের মতো সরকার গঠনের কয়েক মাস পর থেকে দুর্নীতি নিয়ে যত কথা হয়েছে, টিএমসি-র নেতাকর্মীদের বাড়িতে যতবার ইডি, আইটি, সিবিআই তল্লাশি চালিয়েছে, যত টাকা পয়সা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে স্বাধীন ভারতে; পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই অন্য কোনো রাজ্যেও এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি।

গত আড়াই-তিন বছর ধরে সরকার ও শাসকদলের দুর্নীতি নিয়ে এতো তোলপাড় চলছে, কিন্তু জনগণকে কি সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ বা ক্ষিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে? মনে তো হচ্ছে না। চাকরি বাকরি করেন, ব্যবসা থেকে ভালো উপার্জন হয়, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আছে, দেশ কাল সমাজ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ পান এমন মানুষের সংখ্যা শতকরা কুড়ি-পঁচিশ জন। বাকি পঁচাত্তর-আশি ভাগ মানুষই রুজি রুটির ব্যবস্থা করতে প্রতিদিন ব্যস্ত থাকেন। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন। তাঁদের অধিকার নিয়ে ভাবার অবকাশ নেই। এদিক ওদিক থেকে সরকারি

. বেসরকারি যেকোনও অনুদান, ভাতা পেলে তাঁরা খুশি হন। যারা তা দেয় তাদের প্রতি তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। তাঁরা নেতানেত্রীদের গাড়ি বাড়ি বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মাথা ঘামান না। সাধারণভাবে মনে করেন, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। কাজেই দুর্নীতি করার কারণে টিএমসি-র জনসমর্থনে সাংঘাতিক ধস নেমেছে এমনটা বলা যাবে না।

আসলে দুর্নীতির একটা সামাজিকীকরণ ঘটে গেছে। সমাজ জীবনের সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্নীতি আজ আর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। সংগঠিতভাবে বা চেইন সিস্টেমে সম্পন্ন হচ্ছে। সিংহভাগ মানুষই কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। যার যেমন ক্ষমতা সে তেমন দুর্নীতি করে। অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি; এই প্রবচন ক'জন ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করে? বাস্তব সত্য হল, আজকের সমাজ ব্যবস্থায় সৎ থাকাটাই কঠিন। সততা নিয়ে চলার জন্য যে মানসিক দৃঢ়তা ও উন্নত আদর্শবোধ থাকা দরকার তা খুব বেশি জনের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয় না। যেমন, হাজার হাজার চাকরিপ্রত্যাশী নিজেরা লাখ লাখ টাকা শাসকদলের নেতাকর্মীদের হাতে তুলে না দিলে এতবড় নিয়োগ দুর্নীতি হওয়া সম্ভব ছিল না। এঁরা সবাই এই দুর্নীতির স্টেকহোল্ডার। দুর্নীতির কারণে যাঁরা চাকরি পাননি তাঁরা যদি শাসকদলের বিপক্ষে থাকেন তবে অবৈধভাবে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন তাঁরা শাসক দলের পক্ষে আছেন। অর্থাৎ দুর্নীতির অভিযোগে ভোটের অঙ্কে শাসকদলের খুব একটা ক্ষতি হচ্ছে না। যেভাবে বিভিন্ন পেশাজীবীদের দুর্নীতির শৃঙ্খল স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে সেভাবেই নেতানেত্রীদের দুর্নীতি এখন আর অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করা হয় না। এটা সর্বসাধারণের গুরুতর মানসিক অবক্ষয়। এই মানসিক অবক্ষয় রোধ না হলে দুর্নীতিগ্রস্থ দল বা নেতানেত্রীদের ভোটে ভরাডুবি হবে না। ভোটের রাজনীতিতে সৎ রাজনীতিকরা কোনো বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন না। তাঁরা শ্রদ্ধা, ভালোবাসা পান কিন্তু ভোট পান না। আসলে যা হওয়া উচিৎ বলে মনে করা হয় বাস্তবে তা অনেক ক্ষেত্রেই হয় না।

'শত্রুর শত্রু মিত্র' ফর্মুলা অনেক সময়ই বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গে বাম-কংগ্রেসের জন্য পদত্যাগী বিচারপতি তথা বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই ঘটনার সাম্প্রতিক উদাহরণ। উনি নিয়োগ দুর্নীতির বিচার প্রক্রিয়ায় নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কাজ করছিলেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা নিয়ম মেনে করা হচ্ছিল না। রীতি ভেঙে সংবাদমাধ্যম দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিলেন। রাস্তাঘাটে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠনের মঞ্চে গিয়ে বক্তৃতা দিলেন। এজলাসে বসে অতিরিক্ত অবান্তর কথা বলতেই থাকলেন। পদ ও প্রতিষ্ঠানের ওপরে ওঠার অপচেষ্টা অব্যাহত রইলো। তবু তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি হতেই থাকল কারণ তখন তিনি রাজ্য সরকার ও শাসকদলের বিরুদ্ধে 'প্লেয়িং টু দ্য গ্যালারি' খেলছিলেন। সেই তিনি বামেদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 'পারিবারিক পার্টি' জাতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্ব খুঁজে না পেয়ে তৃণমূলকে দংশন করতে 'বেলেবোরা' হয়ে বিজেপি-তে যোগদান করলেন। তিনি আজ গান্ধীজি ও গডসের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে পারেন না। আদালতের 'ভগবান' রাজনীতিতে এসে 'শয়তান' হলেন। বিচিত্র ভারতে বোধহয় রাজনীতির মতো বিচিত্র কিছুই নেই।

*(লেখক কাবিলপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক)*

# মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেন হঠাৎ আক্রমণাত্মক মোদী

অপূর্বানন্দ

এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার ত্রাণকর্তা হিসেবে নির্বাচনে লড়ার কৌশল বেছে নিয়েছেন। এটা স্পষ্ট করা হয়েছে, হিন্দুদের স্বার্থের সুরক্ষা মানে মুসলমানদের কাছ থেকে তাঁদের সুরক্ষিত রাখা।

মোদি ও বিজেপির মতে, মুসলমানদের সঙ্গে মিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বিরোধী দল কংগ্রেস। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো হিন্দুদের সম্পদ ও অধিকার কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়া।এ জন্য ভারতীয় ভূখণ্ডে হিন্দুরা বিপদের মুখে রয়েছেন।

মোদি স্পষ্টত একটি বিপজ্জনক খেলা খেলছেন। নির্বাচনকে হিন্দু-মুসলমানের লড়াইয়ে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। আর বিজেপি নেতারা প্রকাশ্যে দলটিকে 'হিন্দুদের দল' বলছেন। মোদির বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে এটাই বোঝা যায়, তিনি শুধু হিন্দুদের বিজেপির ভোটার হিসেবে ভাবছেন। দলের অন্য নেতারাও এমনটাই ভাবছেন।

নরেন্দ্র মোদি গত রোববার রাজস্থান রাজ্যে একটি নির্বাচনী সমাবেশে বলেছিলেন, 'যদি বিরোধীরা ক্ষমতায় আসে, তাহলে তারা হিন্দুদের সম্পত্তি কেড়ে নেবে। যাঁদের বেশি সন্তান রয়েছে, তাঁদের সেই সম্পত্তি দিয়ে দেবে।' স্পষ্টতই মুসলিমদের প্রতি ইঙ্গিত করে এ মন্তব্য করেন মোদি। তিনি মুসলমানদের ভারতীয় ভূখণ্ডে 'অনুপ্রবেশকারী' বলেও অভিহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্য ভারতে অনেকের মনে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। মোদির মন্তব্যকে 'ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য' হিসেবে উল্লেখ করে ভারতজুড়ে অনেক নাগরিক ও অধিকার সংগঠন তাঁর (মোদির) বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছে।

অধিকার সংগঠন পিপলস ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ বলছে, প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক উসকানি দেওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদিকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।

এত বিতর্ক-সমালোচনা মোদিকে দমাতে পারেনি। দুদিন পর গত মঙ্গলবার রাজস্থান রাজ্যে আরেকটি নির্বাচনী সমাবেশে মোদি আবারও দাবি করেন, কংগ্রেস ভারতজুড়ে হিন্দুদের সম্পত্তি হস্তগত করা ও সেসব 'নির্ধারিত' মানুষের মধ্যে বিতরণ করার ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

শুধু কি তা-ই, মোদি আরও অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেস শিক্ষা, চাকরি, সরকারি প্রকল্প থেকে অনগ্রসর শ্রেণি, তফসিলি জাতিগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের জন্য নির্ধারিত কোটা কেড়ে নেবে। সেসব কোটা দেওয়া হবে মুসলমানদের। এর মধ্য দিয়ে মোদি স্পষ্টত পিছিয়ে পড়া হিন্দু ও দলিতদের ভোট বিজেপির বাক্সে টানার চেষ্টা করেছেন।

মোদি ও বিজেপির এমন আচরণ ও প্রচার কৌশল স্পষ্টত ভারতের নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন। কেননা এতে ধর্মীয় কিংবা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভোটারদের বিভাজন, ভোট চাওয়া বা প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আছে।প্রচারে

সাম্প্রদায়িক বক্তব্য ভারতের গণপ্রতিনিধি আইনেরও লঙ্ঘন। এতে দোষী সাব্যস্ত হলে যে কারও সর্বোচ্চ ৬ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

মোদি একাই নন, গত মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস ভারতে ইসলামিক আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যোগীর এমন মন্তব্য ছিল ভারতে ইসলামীকরণের ভীতি জাগানোর একটি সুস্পষ্ট অপচেষ্টা।

বিজেপি নেতা মোদি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি তাঁর বক্তব্যে 'মুসলমান' শব্দটি একবারও উচ্চারণ করেন না। কিন্তু এরপরও তিনি মুসলিমদের চরম অবমাননা, উপহাস ও আক্রমণ করতে সিদ্ধহস্ত। উদাহরণ হিসেবে ২০০২ সালের ঘটনা বলা যেতে পারে। তখন মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ভয়ংকর দাঙ্গায় গুজরাটে হাজারো মুসলমান ঘরবাড়ি হারান। উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

ওই সময় মুসলমানদের আশ্রয় নেওয়া শিবিরগুলো একে একে গুঁড়িয়ে দিতে শুরু করে মোদির রাজ্য সরকার। দেশ-বিদেশে তুমুল সমালোচনা হয়। মোদি কটাক্ষ করে বলেছিলেন, তিনি 'শিশু উৎপাদনকারী কারখানা' চালু রাখার অনুমতি দিতে পারেন না।

মুসলমান শব্দটি একবারের জন্যও উচ্চারণ না করে মোদি বলেছিলেন, এঁরা এমন মানুষ, যাঁদের উদ্দেশ্য (মোটো) আমরা ৫ জন, আর আমাদের হবে আরও ২৫ জন।দ মুসলিম পুরুষদের চারটি বিয়ে করা ও ২৫ জন সন্তান নেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে মোদি এমন ব্যঙ্গ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

গত রোববার রাজস্থানের বক্তব্যেও মোদি মুসলমানদের 'যাঁরা অধিক সন্তান জন্ম দেন' ও 'অনুপ্রবেশকারী' বলে কটাক্ষ করেছেন।

এর মধ্য দিয়ে নির্বাচনের ডামাডোলে মোদি একটি বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, ভারতীয় মুসলমানরা বাইরে থেকে এসেছেন। এখন তাঁরা অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে সংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ছাড়িয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন।

মোদি স্পষ্টত একটি বিপজ্জনক খেলা খেলছেন। নির্বাচনকে হিন্দু-মুসলমানের লড়াইয়ে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। আর বিজেপি নেতারা প্রকাশ্যে দলটিকে 'হিন্দুদের দল' বলছেন। মোদির বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে এটাই বোঝা যায়, তিনি শুধু হিন্দুদের বিজেপির ভোটার হিসেবে ভাবছেন।দলের অন্য নেতারাও এমনটাই ভাবছেন। গত বছর আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি স্থানীয় বাংলাভাষী মুসলমান ভোটারদের ভোট বিজেপির বাক্সে চান না।

বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোটারদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সাড়া পায়নি বিজেপি। এ কারণে দলটির নেতারা মরিয়া আচরণ করছেন। তাই তাঁরা পুরোনো কৌশল বেছে নিয়েছেন। আর সেটা হচ্ছে বিভাজন। মুসলমানরা ভারত দখল করে নেবে, এমন ভয় তৈরি ও হিন্দু মেরুকরণের মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে বিজেপি।

*অপূর্বানন্দ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দির শিক্ষক। প্রথম আলো (২৫ এপ্রিল ২০২৪) থেকে পুনর্মুদ্রিত।*

# স্বদেশী আন্দোলন, হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক এবং রবীন্দ্রনাথ

শুভ বসু

১৯০৫ সালে ১৬ জুলাই ভারতের বড়লাট কার্জণ সাহেব বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন। বঙ্গভঙ্গ বলতে নানা বিধ ভাসা ভাসা ধারণা প্রচলিত আছে। সেকালের বাংলা আসলে ছিল একটি বিরাট প্রেসিডেন্সি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার প্রশাসনের অধীনে এক সময় বর্তমান উত্তর প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল।যে কারণে ১৮৫৭ সালে যে বেঙ্গল আর্মি বিদ্রোহ করেছিল, তাতে ছিল মূলত পূর্বিয়া হিন্দুস্তানী সিপাহী। তাঁরা ছিলেন বর্তমান ভারতের পূর্ব উত্তর প্রদেশ, সেকালের দেশজ রাজ্য অযোধ্যা অঞ্চল এবং উত্তর বিহারের অধিবাসী।একই ভাবে অসম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে ১৮২৬ সালে।১৮৭৪ সালে বাংলা থেকে আলাদা হয়ে অসম একটি প্রদেশ হিসাবে স্বকৃতি পায়। ১৮৭৪ সালে অসম প্রদেশ গঠনের সময়ের ভারতের বর্তমানে যে সাতটি উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্য আছে তার মধ্যে অরুণাচল এবং দেশজ রাজ্য ত্রিপুরা বাদ দিয়ে সব কটি অসম প্রদেশের অধীনে ছিল।সেই সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট মানে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ যুক্ত ছিল। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ অসম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হলো। একালের বাংলাদেশের সব জেলা শুধু বৃহত্তর যশোহর এবং খুলনা অঞ্চল বাদ দিয়ে পূর্ববঙ্গ এবং অসমের অন্তর্গত ছিল। এখনকার পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা এবং জলপাইগুড়ি জেলা পূর্ববঙ্গ এবং অসমের সঙ্গে যুক্ত হলো। সে যুগে কোচবিহার ছিল দেশীয় করদ রাজ্য।১৮৭২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রথম জানা যায় যে বাংলায় বাংলাভাষীর মধ্যে মুসলমান প্রায় অর্ধেক এবং ১৮৮২ সালে দেখা যায় বাঙালিদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং তাঁরা মূলত পূর্ববঙ্গের পদ্মা মেঘনা এবং যমুনার উর্বর পলিমাটি অঞ্চলে থাকেন যেখানে অবিভক্ত বাংলার মূল জনবসতি। কিন্তু বাংলার শ্রেণী বিন্যাসে সে যুগে মধ্যবিত্তর মধ্যে বাঙালি মুসলমান প্রায় নেই। হিন্দু জমিদার মুসলমান প্রজা, হিন্দু পেশাজীবী শেণির মানুষ এবং মুসলমান মক্কেল, রোগী প্রভৃতি।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৮৫ সালে দীর্ঘ্য কৃষক বিদ্রোহের ফলে ধনী এবং অবস্থাপন্ন কৃষকরা জমির উপর অধিকার পান। সেই সময় আবার পাট কলের আবির্ভাবের ফলে পূর্ববঙ্গে পাট চাষ বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী পাটের বাজার থাকায় ধনী পাট চাষিদের হাতে অর্থের সমাগম হয়। সেই সময় এই ধনী চাষিরা তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে এবং কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে থাকেন। তৈরী হয় এক উদ্ভিন্ন বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী যার মূল ছিল পূর্ববঙ্গে। যদিও বাংলার মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ছিল উর্দু ভাষী আশরাফ জমিদারদের হাতে; ঢাকার নবাব পরিবারের স্যার খাজা সলিমুল্লাহ বা ফরিদপুরের নবাব আব্দুল লতিফ এবং কলকাতার বিচারক আমির আলী প্রমুখের হাতে। তবে ১৯০৫ সালের নতুন পূর্ববঙ্গ এবং অসম প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় শতকরা ৬৬ ভাগ। এবং অসম তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সেই সময় পূর্ববাংলা থেকে জনসংখ্যার চাপে এবং জমিদারদের অত্যাচারে বহু মুসলমান কৃষক অসমে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মপুত্রের চর অঞ্চলে অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলায় বসবাস শুরু করেন।

১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পরে কলকাতায় হিন্দু বাবুসমাজে আলোড়ন শুরু হয় এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিবাদ করে। সেই সময় অবশ্য ফার্সি ভাষার প্রখ্যাত পন্ডিত এবং কোরান শরীফের অন্যতম বাংলা অনুবাদক গিরিশ চন্দ্র সেন হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একমাত্র বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিলেন। আবার অন্যদিকে শুরুতে সেন্ট্রাল মুহাম্মাদান্ এসোসিয়েশন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য জ্ঞাপন করেন। মোসলেম ক্রনিকল, দেলোয়ার হোসাইন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কাজিমুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী এমন কি নবাব খাজা সালিমউল্লাহ এর বিরোধিতা করেন। উদ্ভিন্ন মুসলমান মধ্যবিত্ত রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের মধ্যে আব্দুর রাসূল, খান বাহাদুর মুহাম্মদ ইউসুফ, মুজিবুর রহমান, আব্দুল হালিম গাজনাভি, লেখক ইসমাইল হোসাইন সিরাজী, কবি মুহাম্মদ গোলাম হোসাইন, মৌলভী লিয়াকত হোসাইন, সৈয়দ হাফিজুর রহমান চৌধুরী এবং বর্ধমানের উকিল আবুল কাসেম বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মত দেন। এর মধ্যে বর্ধমানের আবুল কাসেম, যিনি হলেন পরবর্তীকালের প্রখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাসিমের পিতৃদেব, ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণহস্ত। সে কথা আবুল হাসিম সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। লেখক ইসমাইল হোসাইন সিরাজীও ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের ভক্ত। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ তুরস্ক ভ্রমণে তিনি বাঙালি পাঠকের কাছে এনভার পাশার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তুরস্কের সুরেন্দ্রনাথ বলে। তবে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ কালে ভাষণ দিয়ে বলেন মুসলমানদের মুঘল শাসনের পরে এই প্রথম এতো বড় সুযোগ আসবে। ঢাকা আবার হবে পূর্ব বাংলার রাজধানী। নতুন প্রদেশে শিক্ষার প্রসার হবে সরকারি অনুদান আসবে। পূর্ববাংলার উদ্ভিন্ন মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের কাছে তা ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিকতাবাদের থেকে মুক্তির উপায়। নবাব খাজা সলিমুল্লা বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করেন। ১৯০৬ সালে ঢাকাতেই মুসলিম লীগ আত্মপ্রকাশ করে নবাব খাজা সলিমুল্লার নেতৃত্বে। যদিও বাংলার মুসলমান এই সংগঠনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন নি।

*(পরের সংখ্যায়)*

*লেখক টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক*

## মনমোহন সিং বনাম নরেন্দ্র মোদি

সৌর বসু

ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের রূপকার, মনমোহন সিং তাঁর রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ করলেন এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে। দীর্ঘ ৩৩ বছর তিনি ছিলেন সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য। অর্থনীতির কৃতি ছাত্র মনমোহনের জন্ম পশ্চিম পাঞ্জাবে। অত্যন্ত সাধারণ ঘর থেকে উঠে এসে তিনি শিক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাস করে তিনি কেমব্রিজে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে যান। সেখানেও তিনি তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন।

মনমোহন সিংহ প্রথম জীবনে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তখন তিনি সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন, অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের।

১৯৭২ সালে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। ১৯৯১ সালে তিনি নরসিংহ রাও পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সময় ভারত বিশেষ আর্থিক দুর্বিপাকে পড়েছিল। বিদেশি মুদ্রার তহবিল প্রায় তলানিতে এসে ঠেকে। রাজস্ব ঘাটতিও এই সময় খুব বেশি ছিল এবং Balance of payment খাতেও ঘাটতি প্রকট ছিল। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে ভারতের অর্থনীতি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। পশ্চিম এশিয়া থেকে কর্মরত শ্রমিকেরা বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতে পাঠাতো। এই অর্থ ভারতের বিদেশি মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উপায় ছিল। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় তেলের দাম বাড়ার ফলে, বিদেশ থেকে পাঠানো মুদ্রার পরিমাণ ব্যাপক পরিমাণে কমে যায়। এর পরিণামে বিদেশি মুদ্রা ভান্ডারে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি দেখা যায়। মাত্র দু'সপ্তাহ আমদানি মেটানোর মত অর্থ মুদ্রা ভান্ডারে অবশিষ্ট থাকে। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর পরামর্শে অর্থনৈতিক উদারীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ভারতের অর্থনীতি সংক্রান্ত যে বিধি-নিষেধ ছিল তার ব্যাপক সংস্কার করা হয়। রাজস্ব খাতে ব্যাপক ঘাটতির কথা বলা হয়েছে। ভারতের মোট জিডিপির আট শতাংশে নেমে আসে রাজস্ব ঘাটতি এবং মোট উৎপাদনের দুই শতাংশে নেমে আসে চলতি খাতে (current account) ঘাটতি। জিনিসপত্রের মূল্য এরই পাশাপাশি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে।

দেশের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং। প্রধানমন্ত্রী পদে উপবিষ্ট নরসিংহ রাও। অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে নরসিংহ রাও সরকার, অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সহায়তায় দুধাপে টাকার অবমূল্যায়ন করেন। আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের কাছ থেকেও ঋণ নেওয়া হয়। অর্থ ভান্ডারের চুক্তি অনুসারে ভারতে মজুদ সোনা বিদেশি ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখতে হয়। এছাড়াও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। রপ্তানির উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেওয়া হয়। লাইসেন্স প্রথার সংস্কার করা হয়। ১৮ টি শিল্প বাদে অন্য সকল শিল্পর উপর থেকে বিধি নিষেধ শিথিল করে দেওয়া হয়। প্রবল বিরোধিতার মুখে নরসিংহ রাও সরকার মনমোহন সিংয়ের প্রাজ্ঞতা এবং সততার উপর ভিত্তি করে এই সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করে। এই সংস্কারের ফলে ভারত আর্থিক সঙ্কট থেকে অনেকাংশে মুক্তি পায়। ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শিল্প প্রসারিত হয়। অর্থনীতি ক্রমশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এই আর্থিক উদারীকরণ নীতির কিছু নেতিবাচক দিকও সমালোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। মুক্তদ্বার নীতি গ্রহণের ফলে ভারতের বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, জিডিপির হারেরও প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু তার সুফল সমভাবে বন্টিত হয়নি। তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মনমোহন সিংহ ভারতের উদার অর্থনীতির জনক। ২০০৪ সালে কংগ্রেস লোকসভা ভোটে জয়ী হলে মনমোহন সিংকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার কাজ স্মরণীয়। তিনি দেশের অর্থনীতির দরজা পৃথিবীর কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু দেশের দরিদ্র জনগণের জন্য তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ নেন।

তিনি দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিশেষ করে গ্রামে বসবাসকারী দরিদ্র মজুরদের জন্য একশ দিনের কাজ প্রকল্পটি গ্রহণ করেন। এই প্রকল্পর মাধ্যমে, গ্রামের দরিদ্র মানুষের অধিকার সম্পর্কে তিনি তাদের সচেতন করে দেন। গরিব মানুষকে কাজ দেওয়ার জন্য সরকার দায়বদ্ধ; এই ধারণাটা তিনি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই এই প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজ আমরা অনুভব করতে পারছি। কোভিদ মহামারীর সময় যখন দূর-দূরান্ত থেকে গরিব মানুষেরা কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরে এলো, তখন তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল এই ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পটি। যার পুরো নাম মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন।

মনমোহন সিংহ সরকার ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইন পাস করেন। এই আইনের মাধ্যমে একজন ভারতীয় নাগরিক কোনও সরকারি সংস্থা অথবা সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন কোনও সংস্থার কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করতে পারে। সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই তথ্যের যোগান দিতে দায়বদ্ধ। এই আইনটি প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভারতের মতো বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত আরো পোক্ত হয়।

মনমোহন সিং ১৯৯১ সালে যে অর্থনৈতিক সংস্কার করেন, তার সুফল পরিলক্ষিত হতে থাকে একবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। ২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল অবধি বার্ষিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৫ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ। এরমধ্যে ২০০৭-২০০৮ সালে পৃথিবীব্যাপী মন্দার কারণে অর্থনীতির বৃদ্ধির হার কমে যায়। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে ২০১৬ সাল অব্দি ভারতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশর নিচে নামেনি।

২০১৪ সালের নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসেন। ২০১৬ সালে তিনি demonetisation বা বিমুদ্রাকরণ করেন। এই পদক্ষেপ ভারতের অর্থনীতির পক্ষে সুখকর হয়নি। অমর্ত্য সেন, কৌশিক বসুর মতো প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদরা এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন। ২০১৬ সালের পর থেকে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করে। ২০২০ সালে কোভিড মহামারী সময় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। প্রবৃদ্ধির হার ৩.১ শতাংশে নেমে আসে।

২০০৪ সালের পর থেকে মনমোহন সিংয়ের আমলে প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। দেশের স্থির মূলধন মোট জাতীয় উৎপাদনের ২৪ শতাংশে এসে পৌঁছয়। এই হার বজায় থাকে ২০১২ সাল অবধি। মনমোহন সিংয়ের প্রথম পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০০৪ থেকে ২০০৯ দ্বিতীয় ৫ বছরের থেকে অনেক বেশি গৌরবময়। এই পাঁচ বছরে মনমোহন সিংয়ের সরকারকে বামপন্থীরা সমর্থন করে। বামপন্থীদের সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এই সময় ভারত সরকার গ্রহণ করে। কিন্তু ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক পরমাণু চুক্তির কারণে বামপন্থীরা সরকার থেকে সমর্থন তুলে নেয়। পরে ২০০৯ থেকে ২০১৪ মনমোহন সিংয়ের সরকারের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ ওঠে। টুজি স্পেকট্রাম ও কয়লার ব্লক বিতরণ নিয়ে CAG বিনোদ রাইয়ের সরকার বিরোধী বিবৃতি কাজে লাগিয়ে বিজেপি ও আন্না হাজারে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রমুখ দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। কর্পোরেট পরিচালিত মিডিয়া ভয়ঙ্কর ভাবে বিজেপির হয়ে প্রচারে নামে। দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। কংগ্রেস দল হিসেবে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও সাম্প্রদায়িক শক্তির মিথ্যা প্রপাগান্ডা রুখতে ব্যর্থ

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসেন এবং ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি গুলি তিনি রূপায়িত করেন না। তিনি বলেছিলেন, বিদেশ থেকে কালো টাকা এনে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের ব্যাংক একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা দেবেন। কিন্তু তা হয়নি। তিনি ক্ষমতায় আসার পর মূল স্লোগান ছিল 'সব কা সাথ সবকা বিকাশ'। বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে বিভাজিত করা হচ্ছে। মুসলমান খ্রিস্টানদের ক্রমশ কোণঠাসা করা হচ্ছে। মিথ্যা অভিযোগেগরু পাচারের নামে, গো হত্যার নামে, গো মাংস ভক্ষণের নামে সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হচ্ছে। যারা মাছ মাংস খায়, মোদী নিজে তাদের 'মোগল মানসিকতা' বলে আক্রমণ করছেন।

দেশকে ক্রমশ হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক বিকৃত করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তার আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বারবার আক্রান্ত হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। চিন্তার স্বাধীনতা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। মনমোহন সিংহের জমানায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষার অধিকার আইন হয়েছিল। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয় মনমোহনের আমলে।

নরেন্দ্র মোদীর আমলে বেকারত্ব সাংঘাতিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী কোভিডের পরে বেকারত্বের হার কমেনি। ২০২১ সালের প্রথম তিন মাসে বেকারত্বের হার ছিল ৮.৬ শতাংশ। মহিলাদের ক্ষেত্রে বিগত বছরের থেকে তা বৃদ্ধি পেয়ে বেকারত্বের হার দাঁড়ায় ১১.৮ শতাংশে। কোভিডের আগে ৪৩ শতাংশ ছিল employment population ratio.

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে এই হার সমগ্র বিশ্বে ছিল ৫৫ শতাংশ। বাংলাদেশ এবং চীন দেশে এই হার ছিল যথাক্রমে ৫৩ শতাংশ এবং ৬৩ শতাংশ। গ্রামীণ ক্ষেত্রে ১০০ দিনের কাজের চাহিদা ছিল খুব বেশি। একশ দিনের কাজের প্রকল্পটি ছিল গ্রামের মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। নরেন্দ্র মোদীর সরকার এই প্রকল্পটি সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিল না। প্রকল্পটি নিয়ে তাদের নেতিবাচক মনোভাব ছিল। মোদীজির আমলে এই প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়।

মোদী প্রতি বছর ২ কোটি যুবকের চাকরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি employment population ratio আমাদের দেশে বাংলাদেশ এবং চীনের থেকে কম। কৃষকদের আয় তিনি ২০২২ এর মধ্যে দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কৃষকদের ক্ষোভ যদি না থাকতো, তাহলে দিল্লিতে এত বড় কৃষক আন্দোলন হতো না। আর উনিও ওই কৃষক বিরোধী আইন প্রত্যাহার করতেন না। নির্বাচনের প্রাক্কালেও কৃষক আন্দোলন অব্যাহত আছে।

৯০ এর দশকে উদারীকরণের পর থেকে আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কিন্তু গত কয়েক বছরে, মোদীজির জামানায় এই বৈষম্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তার অন্যতম কারণ আমাদের করের কাঠামো। ২০১৬ সালে বিস্তর ঢাকঢোল পিটিয়ে মোদীজি জিএসটি ঘোষণা করেছিলেন। এই জিএসটির তিনের-চার শতাংশ আসে ধনী ১০ শতাংশের কাছ থেকে। দুই তৃতীয়াংশ আসে দরিদ্রতম ৫০ শতাংশ গরীব মানুষের কাছ থেকে। এক-তৃতীয়াংশ মধ্যবিত্ত ৪০-এর কাছ থেকে অর্থাৎ Oxfam-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, আমাদের

দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ৫০% তাদের আয়ের ৬.৭ % ব্যয় করে সুখাদ্য এবং কুখাদ্যর জন্য, মধ্যবিত্ত ৪০ % সুখাদ্য এবং অখাদ্যের জন্য ব্যয় করে তাদের আয়ের ৩.৩%। অন্যদিকে উচ্চ বিত্তের ১০%, তাদের আয়ের মাত্র ০.৪% ব্যয় করে সুখাদ্য এবং কুখাদ্যের জন্য।

২০১৬ সাল থেকে বিজেপি জামানায় সম্পদের উপর থেকে কর তুলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই বলা হয়েছে। কোভিদের সময় স্বাস্থ্য বাজেট কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও, বর্তমানে তা নিম্নমুখী। বিজেপি সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য জনমুখী বা কল্যাণকামী প্রকল্প গুলির প্রতি বিমাতৃসুলভ মনোভাব। বিজেপি সরকারের অভিমুখ মুনাফা নির্ভর কর্পোরেট বান্ধব অর্থনীতির প্রতি। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যখন কোভিদ মহামারীর সময় দেশের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ছে, ঠিক সেই সময়কালে আদানি আম্বানি প্রমূখ পুঁজিপতিদের সম্পদ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মনমোহন সিংয়ের আমলে যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল, বিজেপি সরকার সেগুলোর প্রতি মোটেই দায়িত্ববান নয়। অথচ কোভিদের সময় আমরা দেখলাম যে '১০০ দিনের কাজ প্রকল্পটি'র উপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মোদি সরকার নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে।

মনমোহন সিংহের সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে আমরা দেখেছি অর্থনীতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য জানার অধিকার, গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি প্রকল্প, শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন বলবৎ হয়েছে।ইউপিএ সরকারের দ্বিতীয় পর্ব, প্রথম পর্বের মত উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা ছিল। প্রশাসনে দুর্নীতির ছায়া পড়েছিল। কিন্তু দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের কোন প্রচেষ্টা হয়নি। হিন্দুত্ববাদীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো সুরক্ষিত ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বা তার পরিবারকে দুর্নীতি স্পর্শ করতে পারেনি। মনমোহন সিংয়ের প্রশাসন পরিচালনার মধ্যে ব্যক্তি মনমোহনের কোন ছায়া পড়তে দেখা যায়নি। তার আমলের যা কিছু সাফল্য তিনি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন।

নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। আমেরিকার একটি জনসংযোগ সংস্থার মাধ্যমে তিনি তার ভাবমূর্তি জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কোটি কোটি টাকা অর্থ ব্যয় করেন। তিনি ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পর থেকেই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি নিম্নগামী হতে শুরু করে। তার আমলে পরিকাঠামোর কিছু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে অনেক ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও বিনিয়োগ সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় সংকট দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের সংখ্যা বেশ বেশি। ইউপিএ আমলে বেকারত্বের হার তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্র গঠন মোদি সরকারের মূল লক্ষ্য। তার ফলে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিভাজিত হচ্ছে। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো আজ আক্রান্ত এবং সর্বোপরি মানুষ মানুষের উপর আস্থা হারাচ্ছে।মনমোহন সিং ছিলেন মৃদু ভাষী, বাস্তববাদী। নরেন্দ্র মোদী উচ্চাকাঙ্খী এবং কর্তৃত্ববাদী।

## মে দিবস জিন্দাবাদ

মহান মে দিবস। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। রক্তঝরা সংগ্রামের পথ পেরিয়ে সারা বিশ্বের শ্রমিকদের কাছে এক গৌরবময় দিন। বিশ্বের বহু দেশেই এই দিন জাতীয় ছুটি। জেনে নিই মে দিবসের কিছু কথা (১) শ্রমিকেরা আট ঘণ্টা কাজের অধিকারের দাবিতে আমেরিকার সব শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন ১৮৮৬ সালের পয়লা মে। (২) শিকাগোর হে মার্কেটের সামনে বিশাল শ্রমিক জমায়েত ও বিক্ষোভ হয়েছিল। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১১ জন শ্রমিক। (৩) হে মার্কেটের শ্রমিক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে। তীব্র আন্দোলনের মুখে শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় সরকার। (৪) শ্রমিকদের আত্মত্যাগের স্মরণে ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে দিনটিকে 'মে দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (৫) তবে যে দেশ থেকে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের লড়াই শুরু হয়েছিল; সে দেশটিতে পয়লা মে শ্রমিক দিবস পালন হয় না। (৬) আমেরিকায় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার 'লেবার ডে' হিসেবে পালিত হয়। (৭) ১৯২৩ সালের পয়লা মে চেন্নাইয়ে 'মহান মে দিবস' পালন করেন মালায়প্পুরম সিঙ্গারাভেলু চেত্তিয়ার। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবেই পরিচিত তিনি। (৮) শোনা যায় হাতের কাছে লাল ঝান্ডা না থাকায় মেয়ের লাল শাড়ি ছিঁড়ে তাই দিয়ে পতাকা তৈরি করেছিলেন। (৯) সেটাই নাকি প্রথম কমিউনিজমের লাল ঝান্ডা উত্তোলিত হয় ভারতের মাটিতে। (১০) ওই একই দিনে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'দি লেবার কিষাণ পার্টি অফ হিন্দুস্তান'।

## কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহার 'ন্যায়পত্র'

অমিতাভ সিংহ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গত ৬ এপ্রিল তাঁদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। ইশতেহারের নাম 'ন্যায়পত্র'। দেশের মানুষের প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে তার অবসান ঘটাবে এই 'ন্যায়পত্রে'র ভিত্তিতে। এই ন্যায় পত্র প্রকাশ হওয়ার পর থেকে নরেন্দ্র মোদীসহ বিজেপির নেতারা ইশতেহার সম্পর্কে অবিরত মিথ্যা প্রচার করে চলেছেন। তাঁরা বলছেন যে এই ইশতেহারে লেখা আছে যে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের ধনসম্পদ মুসলমানদের বিলিয়ে দেবে ইত্যাদি।

এবারের কংগ্রেসের ইশতেহার তৈরির এক লক্ষণীয় ইতিহাস আছে। ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে রাহুল গান্ধী কন্যাকুমারিকা থেকে ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেন। চার হাজার কিলোমিটার হেঁটে প্রবল শীতের মধ্যে তিনি কাশ্মীর পৌঁছান। তাঁর আহ্বান ছিল 'নফরৎ ছোড়ো ভারত জোড়ো'। রাহুল সর্বত্রই বলতেন তিনি 'নফরৎ কী বাজার মে মোহাব্বত কী দোকান খুলি'। এই যাত্রা জনমনে বিপুল সাড়া জাগায়। এরপর তিনি গত ১৪ জানুয়ারি মণিপুর থেকে যাত্রা শুরু করে ৬৮০০ কিমি পথ বাসে, নৌকায়, জীপে চেপে ১১টি প্রদেশের মধ্যে দিয়ে ১৮ মার্চ মুম্বাই পৌঁছন। এই যাত্রার নাম ছিল 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। দেশের মানুষের প্রতি যে অন্যায় হয়ে চলেছে সে সম্পর্কে তিনি এই যাত্রা পথে অসংখ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের আশা আকাঙ্খার কথা শোনেন। বিজেপির লোকেরা তাঁর পথে বিক্ষোভ দেখিয়েছে , তিনি সেখানেই তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি সর্বত্রই বলেছেন পাঁচটি ন্যায় অর্জন করা কংগ্রেসের লক্ষ্য।

এরপর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে সাংসদ শশী থারুরকে দায়িত্ব দেন এই ন্যায় পত্র বা ইস্তাহারের প্রাথমিক খসড়া রচনার জন্য। তিনি প্রতিটি রাজ্যের বিভিন্ন পেশার মানুষজন ও বিদ্বজ্জনের সঙ্গে আলোচনা করে ইস্তাহারের সংক্ষিপ্তসার তৈরী করেন। তারই ভিত্তিতে এই অসাধারণ ইস্তাহার, যা সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর কল্যাণের কথা ভেবে রচিত বলে মানুষজন মনে করেছেন। তাই বিজেপি এর মোকাবিলা করতে না পেরে মিথ্যে ও আজগুবি কথার বন্যা বইয়ে চলেছে। এই ইশতেহারে পাঁচটি প্রধান বিষয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি 'ন্যায়পত্র' শিরোনামে প্রকাশিত। যুব, নারী, কৃষক, শ্রমিক ও ভাগিদারী ন্যায়। সাধারণের কল্যাণের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে পাঁচটি করে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে।

ইশতেহারের শুরুতে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের ১৩৮ বছরের ইতিহাসে দেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি নজর দেওয়ার ঐতিহ্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে দলের ভূমিকা, মহাত্মাজির আত্মত্যাগ, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন। স্বাধীনতার পর দ্রুত শিল্পায়ন, দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভর করা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শক্তিশালী ভিত তৈরী, গবেষণা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বমানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন। এই কাজগুলি ভারতকে বিশ্বের দরবারে এক শক্তিশালী ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকার জনকল্যাণে বিভিন্ন যুগান্তকারী আইন, যেমন তথ্যের অধিকার, জল ও জঙ্গলের অধিকার, জমি ও খাদ্য সুরক্ষা, কাজ পাওয়ার অধিকার (১০০ দিন কাজের) আইনের মত আরও অনেক আইন প্রণয়ন করে সর্বশ্রেণীর মানুষের কল্যাণ করেছিল।

এখন গত পঞ্চাশ বছরে সর্বোচ্চ বেকারি। আর্থিক অসাম্য ব্রিটিশ যুগকে ছাড়িয়ে গেছে, দেশে আজ বিলিওনেয়ার রাজ চলছে। দেশের অর্ধেকের বেশী মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে চলে গেছে এই দশ বছরে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ১২৫ দেশের মধ্যে ১১১ নম্বরে। কৃষকেরা ১৬ মাস ধরে তিন আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেন। ত্রুটিপূর্ণ জিএসটি চালু করার ফলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা হারাচ্ছে। এমএসএমই বা ছোট ক্ষুদ্র, মাঝারি সংস্থাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নারীরা সুরক্ষিত নয়, তপসিল জাতি, উপজাতি বা অন্যান্য পশ্চাৎপর মানুষের জন্য কাজ সৃষ্টি হচ্ছে না। সরকারী বা বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা আধা সরকারী সংস্থায় শূণ্যপদে নিয়োগ বন্ধ। সাংবিধানিক সংস্থাগুলি স্বাধিকার হারাচ্ছে। সংবিধান বিপন্ন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকারের আমলে অর্থাৎ ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে ৬.৭ শতাংশ, বিজেপির সরকারের আমলে তা নেমে হয়েছে গড় ৫.৯ শতাংশ।

দেশের মানুষকে এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার প্রতিফলন এবারের ইস্তেহারে। ন্যায়পত্রে যে ন্যায়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা একটু দেখে নেওয়া যাক।

যুবা ন্যায় ঃ নিয়োগ ভরসা কেন্দ্র, রাজ্য ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে যে ৩০ লক্ষ পদ খালি আছে তা অবিলম্বে পূরণ করা হবে।এছাড়া একটি নিয়োগের জন্য বাৎসরিক ক্যালেন্ডার তৈরী করে প্রতিবছর নিয়োগ চলতে থাকবে।

প্রথম নিয়োগ নিশ্চিতকরণ ২৫ বছরের নীচে প্রতিটি স্নাতক ও ডিপ্লোমায় সফল যুবক যুবতীদের জন্য শিক্ষানবীশ ও বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বেতনে নিয়োগ।

প্রশ্ন ফাঁস শেষ বিভিন্ন চাকুরির পরীক্ষায় প্রায়শই যে প্রশ্ন ফাঁস হয় তা বন্ধ করতে কঠোর আইন প্রণয়ন।

গিগ কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা গিগ কর্মী অর্থাৎ যারা জোমাটো, সুইগি, ওলা, উবের ইত্যাদি জায়গায় কাজ করেন ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তাঘাটে চলতে হয় তাদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া হবে।

যুবা রোশনিঃ যুবক যুবতীদের স্বাধীন ব্যবসায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য ৫০০০ কোটি টাকার স্টার্ট আপ ফান্ড গঠন।

নারী ন্যায় ঃ মহালক্ষী প্রতিটি গরীব পরিবারের একজন মহিলাকে বছরে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।
সংরক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন চাকুরিতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ।
শক্তিদায়িনীকে সন্মান আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও মিড ডে মিলের কাজের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের বেতন দ্বিগুণ করা।

অধিকার মৈত্রী ঃ মহিলাদের আইনী অধিকার রক্ষার জন্য আইনী পরামর্শ ও সহযোগীতার জন্য প্রতিটি গ্রামে অধিকার মৈত্রী কেন্দ্র খোলা হবে।
সাবিত্রী বাই ফুলে হোস্টেল কর্মরতা মহিলাদের জন্য হোস্টেলের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে।

কৃষক ন্যায় ঃ ফসলের সঠিক দাম স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ফসলের নূণ্যতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি প্রদান।
ঋণ মকুব কৃষকদের জন্য স্থায়ী ঋণ মকুব কমিশন।
বীমার টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ফসল নষ্ট হলে ৩০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের বীমার টাকা সুনিশ্চিতকরণ।

সঠিক আমদানী রফতানি নীতি প্রনয়ণ, কৃষকদের স্বার্থে ও তাদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থায়ী ও দৃঢ় আমদানী ও রফতানি নীতির রূপায়ন।
জিএসটি মুক্ত ক্ষেত কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় সরঞ্জামের ওপর বাড়তি জিএসটি চাপানো হবে না।

শ্রমিক ন্যায় ঃ স্বাস্থের অধিকার শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, ওষুধ, অস্ত্রপচার ইত্যাদি পুরো বিষয়টিকে স্বাস্থের অধিকারের আওতায় আনা হবে।

শ্রমের সন্মান ঃ মনরেগা কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের মজুরি দিনপ্রতি নূণ্যতম ৪০০ টাকা সুনিশ্চিত করে জাতীয় নীতি প্রনয়ণ।শহর রোজগার গ্যারান্টি শহরাঞ্চলে মনরেগা ধাঁচের রোজগারের আইন।শ্রমিক সুরক্ষা অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য জীবনবীমা ও দুর্ঘটনাবীমার ব্যবস্থা। সুরক্ষিত রোজগার সরকারি ক্ষেত্রে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের অবসান করা হবে।

অংশীদারি ন্যায় ঃ গণনা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতি ভিত্তিক জনগণনা। সমরক্ষণের অধিকার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তপসিল জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জন্য ৫০ শতাংশ সমরক্ষণ। জল জমি জঙ্গলের আইনি অধিকার অরণ্যের অধিকার আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণের দাবী এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে। তপসিল জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা তপসিল জাতি ও উপজাতিদের জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের জন্য বিশেষ বাজেট তৈরী। নিজের মাটিতে নিজের রাজত্ব যে সব জায়গায় তপসিল উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব জায়গাগুলি তপসিল এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি বাদেও এই ইশতেহারে ক্রীড়াজগৎ, বরিষ্ঠ নাগরিক, নারী উন্নয়ন, মিডিয়া, বিচারবিভাগ, দুর্নীতিরোধ, করব্যবস্থা, শিল্প, পরিকাঠামো, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক, জাতীয় সুরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, পরিবেশ সম্পর্কে বিশদ পরিকল্পনা রয়েছে।

# প্রথম দফার ভোটের পর বিজেপির হাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের পর বিজেপির পায়ের নিচ থেকে যে মাটি সরছে তা স্পষ্ট। ৪০০ আসনের দাবিদার বিজেপি প্রথম দফাতেই বড় ধাক্কা খেয়েছে। ভোটারদের প্রবণতা এবং বিজেপির ভোটকেন্দ্রে নীরবতা থেকে প্রত্যয় হয় ভোটাররা বিজেপির বপন করা ঘৃণার ফসল প্রত্যাখ্যান করেছে।

১. ভোটের প্রথম পর্বের পরে গ্রাউন্ড রিপোর্টগুলো থেকে জানা যাচ্ছে বিজেপি বেশ খারাপউ করবে। প্রধানমন্ত্রীর টুইটও এই আতঙ্কের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। উচ্চ পর্যায়ের এক সূত্র থেকে জানা যায়, মোদি, শাহ এবং নাড্ডার একটি জরুরি বৈঠক ডাকা হয় গভীর রাতে। যেখানে কিছু নতুন 'কৌশল' নিয়ে আলোচনা হয়।

২. প্রথম ধাপে ২১ টি রাজ্যের ১০২ টি আসনে ভোট হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত আসনের গ্রাউন্ড রিপোর্ট এসেছে তাতে ইন্ডিয়া জোট বিজেপির থেকে অনেক এগিয়ে।

৩. ইন্ডিয়া জোট এবং কংগ্রেস তামিলনাড়ু, বিহার, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এমনকি উত্তর প্রদেশেও ভালো ফলের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৪. আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা পরিবর্তনশীল সময়ের লক্ষণ। Axis-My India-র প্রদীপ গুপ্তাকে তাঁর টুইট মুছতে হয়েছিল। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়, ১৩ টি রাজ্যে বিজেপি তার সমর্থনের ভিত হারাচ্ছে।

৫. বিজেপি প্রার্থীরা প্রকাশ্যে বলছেন যে তাঁদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে কারণ এ বার মোদী ফ্যাক্টর নেই।

৬. দশ বছর ক্ষমতায় থাকার পরে নরেন্দ্র মোদীর এখনও কংগ্রেসকে অভিশম্পাত করা ছাড়া আর কিছুই বলার নেই। বলার মতো মতো কোনও কাজ তিনি করেননি, আলোচনা করার মতো কোনও বড় অর্জন তাঁর নেই।

৭. সাক্ষাৎকার থেকে নির্বাচনী মিটিং পর্যন্ত; মোদীকে খুব ক্লান্ত, উদাস এবং শক্তিহীন দেখাচ্ছে। সম্ভবত এটি বার্ধক্যের কারণে। মনে হচ্ছে একজন বৃদ্ধকে জোর করে ধাক্কা দিয়ে এগিয়েও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

৮. নরেন্দ্র মোদির সমাবেশগুলোতে না উঠছে জয়ধ্বনি, সাক্ষাৎকারগুলো থেকেও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করেও, তিনি নতুন কিছু শোনাতে পারছেন না, একই ক্লিশে, একই পুরানো বক্তব্যের আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

৯. অন্যদিকে, রাহুল গান্ধী জনগণের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছেন, কখনও গাড়িতে, কখনও রাস্তায়; সেখানে শক্তি আছে, আশা আছে, যা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে। যুবকদের শতভাগ বিশ্বাস যে, যদি কেউ তাদের জন্য কিছু করতে পারে তা কেবল রাহুল গান্ধী, অন্য কেউ নয়।

১০. বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি এবং দারিদ্র্য দূর করার জন্য কংগ্রেসের পরিকল্পনায় জনগণের আস্থা রয়েছে। সংবিধান নিয়ে খেলা যে বিজেপির বিপর্যয় ডেকে আনবে তা জনগণ বুঝতে পেরেছে।

মানুষ সব বোঝে, চুপ থাকে এবং সময় এলে বড়সড় পরিবর্তন করে। সেই বড় পরিবর্তনের প্রথম ধ্বনি উচ্চস্বরে অনুরণিত হচ্ছে প্রথম দফার ভোটের পর।

এটা স্ফটিকের মতো পরিষ্কার; দক্ষিণে বিজেপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং উত্তরে তার বর্তমান সংখ্যা অর্ধেকেরও কম হয়ে যাবে।